করোনাকালে দুই উৎপাদনের গপ্পো

আবীর চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

কথায় বলে না, একটা দুর্বিপাক এমনি এমনি ঘটে না, তার পেছনে স্বাভাবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি অস্বাভাবিক কারণগুলিও একইভাবে কাজ করতে থাকে। কিছুদিন বাদেই কারণগুলি রং'এ চাপা পড়া দেওয়ালের পুরনো লেখাগুলির মতো ফুটে বেরোতে থাকে। তখন সেটা শাসককে বিব্রত করে। তখন সে কী করে? তখন সে আরও বেশি কিছু চাপাতে চেষ্টা করে। জনগণ যদি যথেষ্ট পরিমাণ জো-হুজুরি যদি করেও, তাহলেও সেটা আখেরে জনগণের গল্প নয়, নেপথ্যের দুই, তিন, চার হুজুরেরই গপ্পো হয়ে দাঁড়ায়। এখন এই করোনাকালে 'কী এমন' ফুটে বেরোচ্ছে আর 'কী' সেই আরও বেশি কিছু, যা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়? ঠিক যেমনটি তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"- রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে - সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

- সমস্তই যদি ভালো না চলে?

- তাহলে সেটা গোপন না করলে আরও মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা"।

ঠিক এমন ঘটনাময়তার দশচক্রে আমরা পড়ে গেছি এই মূহুর্তে। কী ভাবে পড়ে গেছি বা কোথায় পড়ে গেছি তা বলার আগে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করা প্রয়োজন। অপ্রিয়তা করা দূরের কথা অপ্রিয়তা শোনানোটাও অপরাধ।

কিন্তু যা কিছু অপ্রিয়, অকথ্য, তা যেমন রাজারও অসহ্য, তেমনি কিছু অপ্রিয় আছে যা আমাদেরও অসহ্য। সেগুলোর উৎপাদন কিন্তু যথেচ্ছ চলেছে। এই লেখায় সেই উৎপাদনের একটা আখ্যান ও আলোচনা করা হবে।

দুই উৎপাদনঃ একটার চোদ্দটা আরেকটার পোয়াবারো

Society Language and Culture

বিশ্বায়নের আজ তিনদশক পুর্তিতে যে ঘটনাটি আমাদের সবার অচেতনে ঘটে গেছে তা হলো দুই উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতা। এতদিন মনে করা হতো উন্নয়ন হচ্ছে বলেই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, যাকে আমরা 'উন্নয়নের কোড' বলি। বর্তমানে ভারতের সামগ্রিকতা বিবেচনা করলে যে কোনো সাধারণ মানুষও বলে দিতে পারবেন 'উন্নয়নের কথা যত বেশি বলা হচ্ছে, তত উন্নয়ন হচ্ছে না'। অর্থাৎ জীবন আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে উন্নয়নের কোড আলাদা এবং প্রকৃত উন্নয়ন আলাদা। ব্যস ওইটুকুই। এতটা শিখে, ভেবে আমরা আবার অচেতনে চলে যাব, কারণ আবার কোনো ঐতিহাসিক ক্ষণে আমরা জেগে উঠে বাকি আর একটু শিখব। ততক্ষণ অভিজ্ঞতার রাজনৈতিক কচকচি আর মানুষের পাশে থাকার প্রবল দাবি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলবে।

করোনাকালে যা কিছু উৎপাদন হয়েছে তার মধ্যে দেশের মুখে মেকওভার করার যত প্রচেষ্টা হয়েছে, সে তুলনায় কৃষি ও শিল্পোৎপাদন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সবাই বলবেন এ তো জানি। কিন্তু উৎপাদনের কোড তৈরির উৎপাদন কিন্তু বন্ধ হয় নি শুধু নয়, প্রবল গতিতে বেড়েছে। হুমকি দেওয়া থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা সবই চলেছে আমাদের নাকের উপর দিয়ে।

পণ্যটা তবে কার? বিনিয়োগ কার কার আছে?

সাধুসমাজের চীনের পণ্য নিষিদ্ধ করার প্রবল জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্তে যখন আমাদের রক্ত গরম হয়ে পড়ছে, তখন আমাদের দোকান বলে 'আমাজন', ফ্লিপ-কার্ট'এর প্রমোটারি'তে কাদের পণ্য আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা চলবে কি? চীনের পণ্য ঢোকার সম্ভাবনা এইসব নব্য-জাতীয়তাবাদী দোকান নস্যাৎ করে কি না, আমাদের জানা নেই। আবার চীনা পণ্যের পাশাপাশি চীনা বিনিয়োগের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে নব্য জাতীয়তাবাদ। কিন্তু তিন বছরের জন্য 'আই পি এল'এর স্পনসর বলে যাদের ডেকে আনা হলো তাদের শরীরে চীনা বিনয়োগ আছে না নেই? যততা শোনা যাচ্ছে – আছে। শুধু তাই নয় যে কোম্পানি'কে স্পনসরশিপ'এর সুযোগ দেওয়া হলো তারা আরেকটি 'গেমিং' অ্যাপ। এরা খেলায় ঠিকাদারি বা প্রমোটারি করে, সঙ্গে 'ফ্যান্টাসি স্পোর্টস' বলে একটি 'উৎপাদন কোড' বেচে খায়। তাদের নিজেদের এই প্রমোটারি বা ঠিকাদারি গোটা দেশের উৎপাদনের চোদ্দটা বেজে গেলেও "কার উৎপাদিত পণ্য" দেশের ঘরে ঘরে ঢোকানোর পালা শুরু হলো সে সম্পর্কে অচেতনে থাকার

Society Language and Culture

তো মানে হয় না। অতি বড়ো বিপ্লবীও যখন আমাজন'এর সেল'এর দিকে হা-পিত্যেশ করে গোপন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তখন অচেতনতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রশ্নটা তাদের নিয়ে নয় কারণ, তাঁরা সবাই একই প্রজাতির নন, চিন্তা হলো, হঠাৎ করে সপ্তাহ দুয়েক হলো অনলাইনের বাজারের বিজ্ঞাপন্নের দাপট এত বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে কিছু কারণ তো থাকতেই হবে।

যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রদর্শন করা হচ্ছে সেগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমি প্রত্যক্ষ করলে আরও আকর্ষণীয় বার্তা মিলতে পারে। দেখানো হচ্ছে এই জাতীয় অনলাইন প্রমোটারি ব্যবসা আরও ছোট ব্যবসাদার বা দোকানদারের ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করছে। অর্থাৎ এক 'রিটেল'এর উপর আরেক 'রিটেল'। সেখানে একপ্রস্থ শ্রম মার খাচ্ছে। কিন্তু রিটেল'এর তলায় কাদের উৎপাদন প্রমোট করা হচ্ছে – আন্তর্জাতিক পণ্যের ক্ষেত্রে সব 'ফ্যাক্টরি' কোথায় আছে দেখে নিয়ে কেনা হচ্ছে তো!!! নাকি তা সম্ভব নয়? আসলে সম্ভব নয়। 'উৎপাদন থেকে রিটেল' পর্যন্ত যে শ্রম আমাদের দেশে জড়িয়ে আছে, সেটা শুধু 'ডেলিভারি বয়'এর সংখ্যার চেয়ে বেশি না কম? আসলে অনেক বেশি। শুধু ডেলিভারি বয়'এর কুমীরছানা দেখিয়ে গোটা দেশের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বেকার সংখ্যার আসল চেহারাটা গোপন করা ভালো হচ্ছে কি? আর এই জাতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সবসময় খুঁজেও পাওয়া যায় না।

উৎপাদন তো বিশ্বের কোথাও হচ্ছেই, শুধু ভারতের এত বড় বাজারে লকডাউন এবং অন্যান্য কারণে আসতে সমস্যা হচ্ছে, আর যদি বা আসে কেনার লোক বেরোতে পারছে না। এছাড়াও আছে আরও নানা অর্থনৈতিক সমস্যা যেগুলো হয় ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে নাহয় বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। বাজারের এমন প্রমোটার-বাবুরা তো ছিলেনই, কিন্তু পরিস্থিতি তো এমন ছিল না। এমন পরিস্থিতিতেই কি বড়ো অনলাইন প্রমোটারদের নয়া আবির্ভাব? হঠাৎ করে বিজ্ঞাপনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে বছরখানে ধরে এবং গত কয়েক মাসে আরও অনেকগুণ বেড়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের মূল স্লোগানটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ – "এই বাক্সে কী আছে, জিনিস না অন্য কিছু?" শুধু যে জিনিস নেই সেটা যে কেউ বলবেন কারণ প্রশ্নচিহ্ন দেখেই সতর্ক হয়ে যাবেন। কিন্তু অন্য কিছুটা কী? যাকে 'আইপিএল' স্পনসর করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তারা শুধু ঐ 'অন্য কিছু'টাই উৎপাদন করে এবং বেচে। ঐ বিষয়টি বোঝার মধ্যেই বস্তুতত্ত্বের পরবর্তী ভাবনা লুকিয়ে আছে।

Society Language and Culture

'উৎপাদন' কোড এবং 'উৎপাদন-সম্পর্ক' কোড'এর কাল্পনিক ইমেজ

ফরাসী দার্শনিক জঁ বদ্রীলার বলছেন, 'উৎপাদন' নামক শব্দ বা বিষয়টিকে (subject) ঘিরে চতুর্দিকে যেন বৈপ্লবিক কিছুর প্রক্রিয়া চলছে। বৈপ্লবিক কল্পনা। এখানে উৎপাদনের অশরিরী অবস্থান সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে। আসলে ইতিহাসে উৎপাদনের রকমফের (modes) নিয়ে যথেষ্ট বৈপ্লবিক আলোচনা হলেও তা কিন্তু উৎপাদনের নীতি বা মূলনীতি'র কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি। শুধু উৎপাদনের বিষয়ের (content) ঐতিহাসিক এবং দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটের অভিজ্ঞতাবাদী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন সিগনিফায়ার বা অবয়বটিকেই প্রশ্ন করা হয়নি। একটু সহজ করে বললে উৎপাদনের নেপথ্যের পরিকল্পনাটিকেই প্রশ্ন করা হয় নি। শোষণ নিয়ে যত হৈ চৈ, যত আলোচনা হয়েছে তার সিকিভাগও উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে হয় নি। উলটে মনে করা হয়েছে এটাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা। অথচ সেই উৎপাদনের অবয়বটিই গোপনে বা অচেতনে ধনবাদের বিকাশের পথে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এবং সেই অবয়বটির "ফল" ঘিরেই কিন্তু যত কথা, আর যত শোষণের ইতিহাস। আজও সে গোপনে বা অচেতনে বেড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে, এটা কি শুধুই জিনিস নাকি অন্য কিছু?

যাইহোক এই ইতিহাসের বাস্তবতা এতই বিস্তৃত এবং তীব্র যে তার খতিয়ান লিপিবদ্ধ করা কঠিন। তাই উৎপাদক-বাহিনী অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সম্পূর্ণ এক লিখিত ধারণা থেকে কারখানা-মেশিন'এর উৎপাদন ক্ষমতার এক অজানা খতিয়ান'এর মধ্যে বিপ্লবের স্থান সংকুলান হয় না। তাই মূল ফরমুলা'টাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'উৎপাদন' কোড এবং তার অর্থমূল্য, সাইন বা সংকেতমূল্য এবং তাকে ঘিরে কাল্পনিকতার সামগ্রিকতা - এই সামগ্রিক সমীকরণের প্রত্যেকটি উপাদান 'শ্রম' এবং তার মূল্যের নিরিখে নির্ধারিত। তাহলে এই যদি পুঁজি এবং তার রাজনৈতিক-অর্থনীতি'র সত্যতা হয় তাহলে যে কোনো বিকল্প সম্ভাবনাও আসলে পুঁজি'কেই শক্তিশালী করবে। আর পুঁজি'কে আরও কার্যকরী করতে গিয়ে বিকল্প অথচ দারুণ শক্তিশালী সিস্টেম'এর সৃষ্টি করা হবে আর তাতে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়বে বই কমবে না। এই ঘটনা অতীতে স্তালিনযুগের অবসানের পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম সম্মেলনের পর থেকে সোভিয়েতে শেষ তিন দশকে একটু একটু করে শেষে গরবাচভের আমলে দেখা গেছে। আর বর্তমান চীনেও এক অতিশক্তিশালী সিস্টেম'এর নেপথ্যে পুঁজির বাড়বাড়ন্ত অতিমাত্রায় দেখা যাচ্ছে। এ ঘটনা বাস্তব, কিন্তু এটাও বাস্তব যে পুঁজিতন্ত্রের বা ধনবাদের মূল উৎপাদন সিগনিফায়ার বা অর্থক'টিকে চ্যালেঞ্জ না করলে এর বিকল্প মৌলিক পথ নির্ধারণ করা

Society Language and Culture

কঠিন। বদ্রীলার এই প্রসঙ্গে বলছেন আসলে প্রকৃত বিকল্প হিসেবে সঠিক, মৌলিক এবং উপযুক্ত উৎপাদন যোগ্যতা এবং বিকল্প কোড'এর প্রতিষ্ঠা করে ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা'টার অবলুপ্তি ঘটাতে হবে। এক অবিচ্ছিন্ন ও অবিতাড়নযোগ্য উচ্চ-উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে ধনবাদ'এর মূল্যায়ন (law of value) প্রক্রিয়াকেই বিলুপ্ত করতে হবে, কারণ এই মূল্যায়নপর্বই তো যত শোষণের উৎসস্থল। আসলে পুঁজি যেমন উৎপাদনযোগ্যতার বিকাশ ঘটায় তেমনি তাকে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণও করে। তাই একে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে? বদ্রীলার বলছেন, আসলে উৎপাদনের বিনিময়ে পুঁজিকে ব্যবহারের যে প্রতিষ্ঠিত ভাবনা বা সিগনিফায়েড তা সবক্ষেত্রেই উৎপাদনযোগ্যতার মূল চাবিকাঠি বা সিগনিফায়ার'কে গোপন করে, এবং তাকে নিশ্চিতভাবে অবমূল্যায়ন করে। এই সিগনিফায়ার'কে মুক্তি দিতে হবে অর্থাৎ মানুষ বা এমনকি সিস্টেমও যেন তার উৎপাদনযোগ্যতার প্রকৃত মূল্য পায় আর এর সঙ্গে অর্থের বিষয়গত উৎপাদনকেও পুঁজির পরিচালক'এর কবল থেকে মুক্তি দিতে হবে। আরও সহজ করে বলতে গেলে পুঁজির বিকল্প দখলদারি নয়, তা সে যত উন্নতই হোক না কেন, পুঁজির পরিচালকের হাত থেকে প্রথমত মানুষের উৎপাদনযোগ্যতা'কে মুক্তি দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত যেমন তেমন করে প্রয়োজনীয় বিষয়গত ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। স্বভাবতই এই কাজ মানুষের জ্ঞাপনসক্রিয়তার স্বাধীনতা'কেই প্রতিষ্ঠা দেবে, কারণ জার্মান তাত্ত্বিক ইউরগেন হেবারমাসও এই সিগনিফায়ার'এর মুক্তির বিষয়টি না ভেবেই সমাজপটে সমাধানের সহজ কাল্পনিক রাস্তায় হাঁটতে চেয়েছেন। যার ফলে কী হয়েছে, মানুষ জ্ঞাপন-সক্রিয়তার জন্য যে কোনো প্রযুক্তিকে শুধু স্বাগত জানাচ্ছে তাই নয়, মনে করছে প্রযুক্তির দ্বারা এমন জ্ঞাপন সক্রিয়তা ঠিক একটা না একটা পরিবর্তন এনে দেবে। আর যদি নাও আনে, অন্তত ব্যবহার করে 'আপ-টু-ডেট' থাকা তো গেল। আর বিকল্পটা কী দাঁড়াল? নীতিগত না হয়ে, প্রযুক্তির না ব্যবহার বা অর্ধেক ব্যবহার হয়ে থেকে গেল। কেউ কেউ আবার সেটাকেই ব্যক্তিত্বের আরেক প্রকাশ বলে মনে করতে লাগল। দুইয়ে মিলে ক্ষমতার বিকল্পে শুধু জ্ঞাপন-ধারণার বিকল্প দাঁড়াল। সমাজটার কী হবে? সে শুধু গাদাগাদা ফরওয়ার্ড করা মেসেজ গিলতে লাগল আর তার অর্থ বিচার করে মনে করতে লাগল, একটা কিছু হতে পারে।

অবশ্য পাশাপাশি সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কর্পোরেট বিশ্বায়নের বিস্ফোরণের ফলে কর্পোরেট সিগনিফায়েড বা ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা, আর পুঁজিনির্ভর

Society Language and Culture

পরিস্থিতিকে প্রয়োজনীয়তার মোড়ক লাগিয়ে যা খুশি ব্যাখ্যা করার পরিচালকের অযাচিত অধিকারবোধ বা সিগনিফায়ার'এর কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার বিপ্লব যে বড়ই কঠিন সে কথাও বদ্রীলার স্বীকার করেছেন। এইপর্বে বদ্রীলার দেখিয়েছেন, সেই এনলাইটেনমেন্ট বা বুদ্ধিবিভাসা যুগের একচেটিয়া পুঁজিবাদ, যুদ্ধোত্তরপর্বে দেশভিত্তিক বা রাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ এবং সবশেষে বিশ্বায়নপর্বে নতুন করে একচেটিয়া পুঁজির 'মুক্তিতন্ত্রের' পথে এই প্রভাবশালী কোডতন্ত্রই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। ফলে ধনবাদের সিস্টেমগত নীতি'কে প্রতিবাদমুক্ত এবং তার উৎকর্ষের সঙ্গে রীতিমত তাল রেখে শুধুমাত্র ফল হিসেবে শোষণ এবং অসাম্যের প্রতিবাদ করলে এবং তার বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রস্তুতি করলে তা এক দমনমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আর এক দমনমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্মই দেবে। আর পূর্বতন সিস্টেম'এর থেকে আরও উন্নয়ন করার দাবি করবে এবং এই পথে আরও দমনপীড়ন চালাবে।

একচেটিয়া পুঁজির মুক্তিতন্ত্র আসলে একচেটিয়া কোডতন্ত্র

বদ্রীলার বলছেন যখন মার্কস তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনীতি'র ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পুঁজি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ করেন তখন ধনবাদী শিল্পকেন্দ্রিক (capitalist industrial) উৎপাদন নিতান্তই কম এবং বিস্তারিত ছিল না। এছাড়া ধর্ম'ই ছিল মুখ্য প্রভাবশালী শক্তি। ফলে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত মোটেই পরিমাণগত ছিল না বরং গোটা বিষয়টাই ছিল অবয়বগত বিশ্লেষণ। তাই বদ্রীলার পণ্যের রাজনৈতিক-অর্থনীতি বলতে পণ্য-অবয়ব এবং সংকেত-অবয়ব'এর বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, মার্কসীয় পণ্য-অবয়ব হলো উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়ের (exchange) এক শাশ্বত বিমূর্তন (Universal Abstract) এবং সংকেত-অবয়ব হলো পণ্যের সেই বিনিময়ের আসল বাজারী সক্রিয়তা অর্থাৎ পণ্যের বিনিময় বিমূর্তন'কে কনজিউমার বা মানুষ কীভাবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস যেমন বলেছিলেন, 'ধনবাদ মুনাফার জন্য শিল্প, সংস্কৃতি, শ্রম ইত্যাদি সমস্ত মানবিক মূল্যগুলিকে অবমূল্যায়ন করে - বিষয়টি আসলে পণ্যের নয়, সংকেত'এর রাজনৈতিক অর্থনীতি যা শুধুমাত্র মূল্যের বাজারীকরণের ফল নয়। আসল ঘটনাটি হলো পণ্য-অবয়ব থেকে বিনিময়যোগ্য সংকেতগুলি একটি সামগ্রিক কোডতন্ত্রের অধীন হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী এই কোডতন্ত্রই সাম্প্রতিক সময়ে শোষণের সামগ্রিক রূপ। এ যেন অনেকটা দেরিদা'র 'সীমাছাড়ানো অর্থিত'র মতো। ফলে পণ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলিই যেন নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন পণ্যের একইরকম সাইন বা সংকেত'এর উৎপাদন এবং একটি মুখ্য কোড'এর অধীনস্থ হওয়ার

Society Language and Culture

প্রক্রিয়ায়। তাই একরকম সেই কোড'এর বাজারীকরণ চলছে সারা পৃথিবীজুড়েই। একইরকম বাজার-কোড, বিজ্ঞাপন কোড, সংকেতমূল্যের একচেটিয়াকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবে গোটা সিস্টেমটাই একটা একচেটিয়া ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

তাহলে কীভাবে সবকিছু ঘটে এই একচেটিয়া কোডতন্ত্রে? বা যখন কোনো সিস্টেম একচেটিয়া অবস্থান ব্যক্ত করে তখন কীভাবে তার কার্যপ্রণালী সম্পাদিত হয়? তার আগে জানা দরকার কীভাবে মার্কসবাদ'এ একচেটিয়া ধনবাদ'কে পরিমাপ করা হয়েছিল। মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' (The Poverty of Philosophy) গ্রন্থে ডেভিড রিকার্ডো'র উদ্ধৃতি ব্যবহার করে দেখাচ্ছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি বা কোনো কোম্পানি কোনো বিশেষ পণ্য'কে একচেটিয়া করে তোলে, তখন সে তার বিক্রেতা ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে তার পরিমাণ বাড়ায়; ফলে তার মূল্যের সাথে সেই পণ্যের আসল বা স্বাভাবিক মূল্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সেই পণ্যের মূল্য (price) বাজারের প্রতিযোগিতা এবং চাহিদা-যোগানের উপরও নির্ভর করে না, বরং তার উৎপাদন মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস'এর উপর অর্থাৎ শ্রম-সময়ের উপর নির্ভর করে'।

এখন বদ্রীলার বলছেন, তাহলে উপরের বক্তব্য অনুযায়ী যখন কোনো সিস্টেম একচেটিয়া হয়ে ওঠে তখন শ্রম-সময় এবং পণ্যের উৎপাদন-মূল্য কোনোভাবেই সম্পর্কিত থাকে না। তাহলে উদ্বৃত্ত শ্রম এবং তার মূল্যের প্রশ্ন আসছে কি করে? অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রম পরিমাপ করা যাবে কি করে? কিন্তু কেউই চাহিদা-যোগান'এর নিয়ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশি কিছুই ভাবতে পারে না কারণ এই দুটি উপাদান অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী সাধারণভাবে নিজেদের মধ্যে স্বাভাবিক-সমতা প্রতিষ্ঠা করেই থাকে। আসলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্বাধীন নয়, বাজারের উপর নির্ভরশীল। আবার একচেটিয়া বাজারী সিস্টেম তো সবসময় মানুষের চাহিদা'কেই নিয়ন্ত্রণ করে (একচেটিয়া কোড)। যখন প্রতিযোগিতামূলক সিস্টেম শ্রমশক্তির শোষণ নিষ্পেষণের উপরই কার্যকরী হয়, সেখানে একচেটিয়া সিস্টেম তো তার গোটা পরিকল্পনাটাই এমন একটা স্তরে প্রতিষ্ঠা করে যেখানে দ্বান্দ্বিক বা প্রতিবাদী অবস্থান'এর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। একচেটিয়া সিস্টেম'এ চাহিদা-যোগান'এর কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক তো থাকেই না, বরং গোটা ভাবনাটাই একটা চাপিয়ে দেওয়া সমতা'র উপর নির্ভরশীল থাকে। এবং একচেটিয়া সিস্টেম সামগ্রিকভাবেই প্রতিযোগিতার একটা মিথ এবং মিথ্যে'র উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

Society Language and Culture

মিথ ও বিজ্ঞাপনে একচেটিয়া কোড

যেহেতু একচেটিয়া সিস্টেম তার উৎপাদনক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেই থাকে তাই সেই আধিপত্য কায়েম রাখতে যোগান-চাহিদা'র একটা গল্প চালু রাখে। একটা আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রিত উপভোক্তার চাহিদা প্রণালীর মধ্যে অর্থাৎ যেখানে উপভোক্তা'র প্রয়োজন বা অভাব, জ্ঞান, সংস্কৃতি, তথ্য এবং স্বাভাবিক শারীরিক চাহিদা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত থাকে সেখানে চাহিদা-যোগান'এর যে কোনো ধারণাই অবান্তর। একচেটিয়া সিস্টেম চাহিদা'র আকস্মিকতাকেই নস্যাৎ করে 'ভোগভাবনা'কে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এইভাবে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করেই সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক সামাজিকতার একটা ধারণা প্রস্তুত করে অর্থাৎ কী করতে, বলতে হবে আর কী হবে না তার উপর নির্ভর ঠিক হবে যে আসলে কী করতে হবে। বিজ্ঞাপন, লাইফস্টাইল ধারণা হলো পরিকল্পনামাফিক সামাজিকতার সেই কোড। এর কোনো বিপরীত বা বিরোধী অবস্থান হয় না। এক বিজ্ঞাপন না চললে আর এক বিজ্ঞাপন এক স্টাইল না চললে আর এক স্টাইল - এই বিভিন্নতার মধ্যে আসলে এই কোড নিরুপদ্রবে কায়েম থাকে। প্রতিযোগিতামূলক সিস্টেম'এ শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে যে কথা খাটে না।

কিন্তু একচেটিয়া কোডতন্ত্রে মূল কোড'টি ঠিক রাখতে আর সবকিছুই পরিবর্তন করতে হয়। ফলে ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনোমোহন সিং যে নয়াউদারতন্ত্র'এর সূচনা করেছিলেন ১৯৯১ সালে তার মূলে প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তিটা একটি পরিকল্পনামাফিক মিথ্যে। স্বাভাবিক ধারণায় প্রথম কারণটিই অনেকটা সত্যমূলক। যদিও তিনি পরবর্তী সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির হাল দেখে অনুতাপ করেছিলেন যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি আদৌ বাস্তব নয়, বরং এটা একটা ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উপর সার্বিক দখলদারি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই সিস্টেম'এ অর্থাৎ একচেটিয়া কোডতন্ত্রে শ্রমও আর শ্রমশক্তি'তে নেই, আবার বর্তমানে সব কাজেই শ্রমও একটা কোড'এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমসত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু মূল এসইজেড বা মূল একচেটিয়া কোড নিরুপদ্রবে থাকলেই হলো।

ফলে একচেটিয়া কোডতন্ত্রে ভোগভাবনা বা ব্যয়ভাবনা সেটা মোটেই আর বড়লোক'এর একাধিপত্যের উপর নির্ভর করে না। এটা একটা পদ্ধতি বা নিয়ন্ত্রণ'এর একটা কৌশল, যার মধ্যে দ্বন্দ্বের বা বিরোধিতার ঝঞ্ঝাট একেবারে শুষে নেওয়া যায়। তাই তো ব্যয়কৌশলের নতুন

Society Language and Culture

নতুন নিয়মের উপর আমাদের এত টান। বাস্তবিক এইভাবে সামগ্রিকভাবে এক রক্তকরবীর যক্ষপুরীর মধ্যে আমরা বাস করছি।

জিনিসের চেয়ে বেশি কিছু

এখানে চাহিদা এবং প্রয়োজন প্রতিদিন নতুন নতুন পরিসরের অলীকতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আর নতুন উৎপাদকবাহিনী আর সিস্টেম'কে কোনো প্রশ্ন করে না। তারা যেন সব বুঝে গেছে, ভেবে নিয়েছে কেন এই সিস্টেমে তাদের আবির্ভাব। আর সিস্টেমও এই উৎপাদকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন স্টাইল সংকেত বা সাইন আমদানি করে চলেছে যাকে আমরা দেখি ম্যানুফ্যাকচারিং, মার্কেটিং, সেলিং, হিউম্যান রিসোর্স'এর নামে নিত্যনতুন পরিকল্পনা বা স্ট্রাটেজি'র উপর। এছাড়া বিনোদনের নতুন নতুন সাইন'এর উপর যা উৎপাদকবাহিনীর ব্যয়কৌশল'কে কঠিন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আর এই সবকিছুই মুখ্য একচেটিয়া 'ব্যয়' কোডতন্ত্রের স্থিতাবস্থার জন্য। ফলে এই অবস্থায় আমি আমরা শুধু এই সিস্টেম'এর ডাকে সাড়া দিতে পারি, অর্থাৎ একটা শপিং মল যা বলবে তা করতে পারি। কীভাবে করব বা বলব? তার সাইন বা সংকেত দিয়ে তার নিয়মে তার ভাষাতেই বলব। একে শুধু প্রতিযোগিতার অবসান বলা ভুল হবে, এ তার চেয়েও বেশি কিছু। বদ্রীলার বলছেন, এ ঠিক যেন, শ্রম'এর তত্ব দিয়ে গড়া উৎপাদন, শোষণ, মুনাফা সম্বলিত একটা প্রতিযোগিতামূলক সিস্টেম থেকে একটা বিশাল সমন্বিত সাম্রাজ্যে এসে পড়া যেখানে সব মূল্য তাদের 'সাইন' বা সংকেত'এর কার্যকারিতার বিনিময়ে নির্ধারিত হচ্ছে। ফলত এটা একচেটিয়া উৎপাদনতন্ত্র নয়, আসলে একচেটিয়া কোডতন্ত্র। এই কোডতন্ত্রই হলো সেই জিনিসের চেয়ে বেশি কিছু।

আর এই একচেটিয়া কোডতন্ত্রে সবকিছুই সাইন বা সংকেত'এর বলে দেওয়া অর্থ এবং তার অতিবাস্তব কার্যকারিতার উপর নির্ভর করছে। এই অবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের ভাবনা, আচরণ, এবং ভাষা সবটাই এক অদৃশ্য কোড'শক্তির হাতে যেন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। লেনিন কিন্তু বুঝেছিলেন যখন তিনি বললেন 'যন্ত্র আজ আর চালকের অধীন নেই। সে অদৃশ্য গোপন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে'। রবীন্দ্রনাথ থেকে লেনিন সেই অদৃশ্য শক্তি'কে বাইরে এনে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তার প্রতিবিধান করতে চেয়েছিলেন। মার্কসও বলেছিলেন যে মানুষের দ্বারাই এই দৈত্যাকৃতি সিস্টেম আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু আজ আমরা কেন যেন সেই অদৃশ্য কোড'শক্তি-র সম্প্রচারিত কথা আউড়ে যাচ্ছি। আবার গণমাধ্যম যতটা তথ্য আমাদের দিচ্ছে

Society Language and Culture

তার চেয়ে অনেক বেশি কথা এবং বলার ইচ্ছেটাও যেন বসিয়ে দিচ্ছে আমাদের মুখে, আর আমরাও তা সহজেই মেনে নিচ্ছি। টেলিভিশনে চলা সিরিয়ালগুলো যেন প্রতিদিন আমাদের মুখে কথা বসিয়ে দিচ্ছে, আমরাও তা গোগ্রাসে গিলছি। সেই কথা, সেই ভঙ্গি, সেই আচরণ-ই কি আমাদের সমাজজীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে? নাহলে সিরিয়ালে একটি চরিত্রের মৃত্যু হলেও দর্শকদের বিপুল চাহিদা বা দাবিতে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে কেন? জীবনের বাস্তবতার নামে এক সর্বৈব নতুন বাস্তবতার মোড়ক সৃষ্টি করে নতুন জীবনযাত্রা উৎপাদন করা হচ্ছে - এর নাম 'লাইফস্টাইল' রিয়েলিটি শো। কোনো কোনো রাজনীতিবিদের চরম অবক্ষয়ের নমুনা আমাদের সামনে থাকা সত্তেও তাঁকে অবলীলায় জনসমক্ষে আনা হচ্ছে মানুষের চাহিদা বলে - এই কথা কি আমরা প্রকাশ করি বা ব্যক্ত করি? তাহলে আমরা কেন বলি/লিখি/করি - এই ব্যাপারে আমাদের কি সত্যিই কোনো স্বাধীনতা নেই? রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-র এই কথা আজ আমাদের জীবনে যেন দারুণ এক সত্য।

“আমরা বাহিরে আসিয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে - পায়ের শিকল কাটিল না”।

আজ এই বাণীর নির্মম সত্যতা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। রাজদ্রোহিতা থেকে বাঁচবার জন্য আমরা অতি নিজের 'কেন' জিজ্ঞাসাটিকেও সঁপে দিয়েছি ক্ষমতার পায়ে। আমরা কেন বলব, করব, লিখব তার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। 'করব, লড়ব, জিতব' এই কথা আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাঠে গিয়ে শুধু চেঁচানোটাই যেন আমাদের কাজ। 'পছন্দ' করার শ্রমটুকু না দিয়ে, 'লাইক' বিলি করে কাজ সেরে ফেললেই হলো।

আইপিএল-এর ম্যাচে 'সিগনেচার' বা মুখ্য পরিচায়ক বাজনাটি বাজলে, অথবা স্ট্রাটেজিক-টাইম-আউট শেষের দশ সেকেন্ড কাউন্টডাউন-টিতে সবার একসঙ্গে বলাটা যেন আমাদের নিয়মমাফিক কর্তব্য। ক্রিকেট টীমের বিজ্ঞাপন থেকে 'হ্যাপিওয়ালা' ছড়িয়ে পড়ছে আমার সামাজিক 'স্টেটাসে', তারপর আমার সোশ্যাল মিডিয়া স্টেটাসে আর সর্বোপরি আমার কথায়। স্বাধীনভাবে 'শেখা' পরিণত হচ্ছে প্রভুত্বের অনুকরণে এবং অনুসরণে। এবার থেকে আইপিএল’এ দুটি ফ্যান্টাসি গেম দেখতে পাবেন সবাই। এক, আইপিএল নিজেই আর দুই, যে স্পনসর তার উৎপাদিত গেম। এদের নীচে আসল যে খেলা অর্থাৎ ক্রিকেট, সেটির খবর দর্শক ভুলেই যাবে যে, ভারতে রঞ্জি ম্যাচ হয়, দলীপ ট্রফি খেলা হয়। আর আমাদের বিভিন্ন প্রজন্ম

Society Language and Culture

সেই খেলা খেলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। আপনারা নিজে হাতে উৎপাদনের কোড'এর কাছে অধিকার বেচে তারপর অভিনয় করে যাবেন, কেন ঘরোয়া ক্রিকেট'এ লোক হচ্ছে না। এই ভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে 'কোড' প্রভুত্বকে আমরা একরকম স্বীকৃতি দিয়ে চলেছি।

বিশেষ মন্তব্যঃ এই নিবন্ধের মূল অংশটি লেখকের 'মানবসত্ত্বার অভিপ্রায়ঃ দ্বন্দ্বের নানা মুখ" বইতে রয়েছে।

Society Language and Culture